C4T : political process in India.
2nd Semester (H)

Unit- IV- Religion and politics

Ques- ভারতীয় রাজনীতিতে ধর্মের ভূমিকা আলোচনা কর ?

⇒ আদর্শগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মের রাজনীতিতে কোনও ভূমিকা রাখার কথা নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা নিজেই একটি আদর্শ হিসেবে অর্থনীতি সম্পর্কিত বিষয়গুলি থেকে ধর্মকে পৃথক করা হয়েছে। তবে ভারতীয় প্রসঙ্গে, ধর্ম নির্বাচনী প্রচারে, ভোটদানের আচরণ নীতি নির্ধারণ ইত্যাদিতে প্রভাবশালী ভূমিকা নিতে চলেছে। ভোট দাতাদের স্বাধীনতা কম থাকায়, ভোটদান আচরণে যৌক্তিকতার চেয়ে আবেগের প্রাধান্য বেশী রয়েছে। ধর্ম একটি শক্তিশালী সমষ্টিগত বিষয় হওয়ায় ভোটদানের আচরণ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা : ধর্মনিরপেক্ষতা - রাষ্ট্রের পশ্চিমা ধারণার চেয়ে পৃথক। ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের পরিবর্তে, আমাদের সংবিধান রাষ্ট্র এবং ধর্মের মধ্যে মূলত দূরত্বকে বাস্তবমূলক করেছে। ~~ভারতীয়~~ রাজনৈতিক দল গুলি দলীয় রাজনীতির অনুরূপ ভোট ব্যাংক তৈরি করতে ধর্মীয় মেরুকরণ ব্যবহার করেন। কিন্তু রাজনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি হল নিরপেক্ষ থাকা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা।

R- ভারতীয় রাজনীতির প্রমুখ দিকগুলি

সম্পাদিত - নির্মাল্য প্রতিম বসু।

Scanned with CamScanner

ভারতীয় রাজনীতিতে ধর্ম, ভাষা, জাতপাত ও জনজাতির ভূমিকা

উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

রাজনীতি কোন বায়বীয় বস্তু নয় যে তার প্রতিষ্ঠানগুলি সামাজিক ভিত্তি ছাড়াই দণ্ডায়মান থাকবে। অবশ্যই আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম শর্তই হল নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। আইনসভা, প্রশাসনের স্বাতন্ত্র এবং স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা। সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে যে প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করা যায় তার অবয়ব যত স্বচ্ছ এবং আইন নির্ভর হবে ততই তা আধুনিক রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সহায়ক হয়ে উঠবে বলে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু তা নিরন্তর ব্যাহত থাকে সামাজিক নানা উপাদানের দ্বারা। একমাত্রিক সমাজে এই সামাজিক উপাদানগুলির সচলতা তাও রাষ্ট্রীয আইন ও উদ্যোগের দ্বারা কিছুটা প্রশমিত করা সম্ভব। যেমন পশ্চিম ইউরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সমাজ বাস্তবতায়। কিন্তু সেখানেও অর্থনৈতিক নানা প্রশ্ন যখন উপস্থিত হয়। রাজনৈতিক দল বা নেতারা কৌশলে সামাজিক উপাদানগুলিকে সচল করার চেষ্টা করেন বা নানান আরোপিত বৈষম্যকে নির্মান করেন। সে গ্রীসে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটই হোক বা ইউরোপ জুড়ে সিরীয় উদ্বাস্তুদের ভরণ পোষনের ব্যবস্থা কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নব দক্ষিণপন্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্ভট মস্তিষ্ক প্রসূত নানা আকাশকুসুম সামাজিক অনুপ্রবেশের কাহিনী। একেক সময় মনে হয়, এই বুঝি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। কিন্তু শেষ বিচারে আপাত একমাত্রিক সমাজ বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠানগুলি ঠিক আপন গরিমায় অধিষ্ঠিত থাকে। সমস্যা সৃষ্ট হয় বহুমাত্রিক সমাজ জীবনে। বিশেষত ভারতের মতো দেশে যেখানে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান।' এখানে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নিরপেক্ষতা সাংবিধানিক স্তরে যতটা সীমাবদ্ধ ততটাই বাতাহত বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে। আমরা বিভিন্ন উপাদানগুলিক চিহ্নিতকরণ করলেও মূল যে উপাদানগুলি প্রাক্-স্বাধীন পর্ব থেকে অদ্যাবধি ভারতীয় রাজনীতির মূল আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে থেকেছে সেগুলি বাছাই করে নেওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ধর্ম, ভাষা জাতপাত ও জনজাতি সত্তা।

ধর্ম

ভারতের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষ। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে ২৫ থেকে ২৮ নম্বর ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার বর্ণিত আছে। ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধন আইন মারফত সংবিধানের প্রস্তাবনাতেও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাঠামোগত ভাবে ভারত অবশ্যই একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সমস্যা অন্যত্র। প্রতি মুহূর্তে ভারতীয় সত্তাকে তার ধর্মীয় পরিচিতি বহন করতে হয়। এর শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত আছে। বস্তুত ভারতীয় সমাজ বাস্তবতার অন্তরে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার প্রতিটি স্তরে ধর্ম তার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। নির্মোহ সাংবিধানিক অবস্থানে যতই আমরা আটকে থাকি না কেন সমাজ বাস্তবতার মূল উপাদান হিসেবে ধর্মীয় অবস্থানকে অগ্রাহ্য করলে ভারতীয় রাজনীতির মূল সুরটি সঠিক ভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে না। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি সামগ্রিকভাবেই এই ধর্মীয় অনুপ্রবেশের দ্বারা প্রভাবিত। এখানে জাতীয়তাবাদের একটি আবশ্যিক উপাদান হিসেবে ধর্ম সর্বদা হাজির থেকেছে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক Embres-এর ভাষায়, "When religion supplies the vocabulary of nationalissm, as in the middle east, Northern Ireland, or South Asia, conflicts, even if they have their origins in economic issues, assume a religions coloration."

যে সমাজ বাস্তবতায় ধর্মের সাথে রাজনীতির বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রক্রিয়া যথেষ্ট গতি লাভ করেনি সেখানে জাতীয়াবাদী সত্তা নির্মাণে ধর্মীয় অনুপ্রবেশ আটকানো সহজ কথা নয়। দেখা গেছে যে জাতীয়তাবাদী মানসিকতার জন্য যে আবেগঘন শব্দভান্ডার বা বাক্যবিন্যাস প্রয়োজন তা প্রাথমিক স্তরে ধর্মীয় উপাদান অনেক সহজেই যোগান দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্বে প্রয়োজন হয় দেশের জন্য বা বলা উচিত একটি সামগ্রিক সত্তার জন্য আত্মবিসর্জন। এখানে ব্যক্তির নিজস্ব সত্তাকে সামগ্রিক সত্তায় বিলীন করে দিতে হয়। সেই সাহস যোগায় ধর্মীয় নানা অনুষঙ্গ। জাতীয়তাবাদ যেমন তার প্রস্তুতি পর্বে ধর্মকে কাজে লাগায় তেমনি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও নেতৃবৃন্দ জাতীয়তাবাদী অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে জাঁকিয়ে বসে। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলাতার একটি রসায়ন আছে যাকে তার যথার্থ প্রেক্ষিতে না বুঝলে বিভ্রান্তির অবকাশ থাকে। জাতীয়াবাদী প্রতর্কে ধর্মীয় অনুপ্রবেশ কার্যত একটি ধর্মভিত্তিক আধিপত্য নির্মাণের প্রথম ও প্রধান সোপান।

প্রাথমিক স্তরে ধর্ম জাতীয়তা চেতনার উপযোগী ভাষা, শব্দভান্ডার, সঙ্গীত, কাব্য ইত্যাদি নির্মাণ করে জনচেতনার আবেগের উপর প্রভুত্ব তৈরির কাজটা করে। জাতীয় নেতাদের এমনভাবে আলোকিত করা হয় যেন তাঁরা সবাই ঈশ্বর প্রেরিত দূত। এটি বিশেষভাবে সেই সমাজ বাস্তবতার উপযোগী যেখানে জাতীয় চেতনা প্রকৃতপক্ষে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর উত্থানের রূপকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তিব্বতে বা মায়ানমারে বৌদ্ধ ধর্ম, কাশ্মীরে ইসলাম কিংবা শ্রীলঙ্কায় তামিল উপজাতীয় চেতনা নির্মাণে শৈব মতাবলম্বী হিন্দুধর্ম এই ভূমিকা পালন করেছে। সাধারণ ভাবে কোন এগিয়ে জনজাতি বা আরো স্পষ্টভাবে দক্ষিণ এশিয় জনগোষ্ঠীই তাঁদের জাতীয় চেতনা নির্মাণে সম্পূর্ণ ভাবে ধর্মীয় কাঠামোতে বিসর্জন দিতে পারেন না।

জাতীয় সত্তা নির্মাণে ধর্মীয় উপাদনের অনুপ্রবেশ শুধুমাত্র শব্দভাণ্ডার বা আবেগঘন বাক্যবিন্যাসের জন্মই দেয়নি তা একটি নির্দিষ্ট জীবনশৈলীর রচয়িতাও বটে। বস্তুত কোন

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সমাজ জীবনই অদ্যাবধি সম্পূর্ণভাবে ধর্মকে পরিহার করে প্রসারিত হয়নি। কিন্তু আমাদের দেশে ধর্মীয় অনুপ্রবেশ যেভাবে ঐতিহাসিক মাত্রা পেয়েছে তা এক কথায় তুলনারহিত। ভারতীয় জাতীয়বাদাদের নির্মাণে ধর্ম তার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় মাত্রাতেই সমান ক্রিয়াশীল থেকেছে। তা ইতিবাচক যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলিদানের ইচ্ছুক দেশপ্রেমিকেরা ধর্মের কাছে পেয়েছে যথার্থ আশ্রয়। দেশ এবং সামগ্রিক সত্তার প্রতি অবিমিশ্র ভালবাসার কাঠামো তৈরি করেছে ধর্ম।

কিন্তু যতটা না ঐক্যসাধন হয়েছে, ধর্মীয় উপাদানের অনুপ্রবেশ বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিক জীবনশৈলীর ব্যবদান গুলিকে প্রসারিত করেছে ঢের বেশি। এবং অতি প্রকট ভাবে তা জারিত হয়ে দেশভাগের পটভূমি নির্মাণ করেছে। আমরা এই দ্বৈত সত্তাকে দুটি-ঐতিহাসিক কালপর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি। এই দুটি কালপর্ব হল ১৯২০-র আগের জাতীয়তাবাদ এবং ১৯২০-র পরের জাতীয়তাবাদ।

আমরা জানি যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গঠনের পর প্রথম দুই দশক যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন মূলত নরমপন্থী। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাদাভাই নৌরাজী, ফিরোজশাহ মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা ভারতবাসীর প্রাথমিক দাবিদাওয়াগুলিকে চিহ্নত করলেও ব্রিটিশ উপনিবেশের সটান উচ্ছেদ চাননি। তাঁর পাশ্চাত্য শিক্ষা, ভাবধারা ও মূল্যবোধের অনুরাগী ছিলেন এবং অবশ্যই সেই সূত্রে ছিলেন নিখাদ প্রতিষ্ঠানপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ নেতা। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই এই ভাবধারার একটি প্রতিস্পর্ধী রূপ আমরা দেখতে পেলাম। ব্রিটিশদের চোখে প্রথমটি যদি হয় নরমপন্থী, দ্বিতীয়টি হল চরমপন্থী। লর্ড কার্জন পরিকল্পিত বঙ্গভঙ্গের বিরোধতায় এবং স্বদেশী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এই চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও তাঁরা শুধুমাত্র বঙ্গভঙ্গ রদ করার মধ্যেই নিজেদের সক্রিয়তাকে আচ্ছন্ন করে রাখেন নি। অতি নির্দিষ্ট ভাবে জাতীয় চেতনা নির্মাণের অভিপ্রায়ে তাঁরা প্রতিটি সামাজিক উপাদানকে সচল করে তুলেছিলেন। এটিকে তাঁরা এমনই গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে ভারতে জাতীয় চেতনার উন্মেষে এই কালপর্ব একটি বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত।

কিন্তু বিষবৃক্ষ ঐ সময়েই রোপন করা হয়েছিল। চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ, যথা, অরবিন্দ ঘোষ, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল বা লালা লাজ পত রাই-এরা হিন্দুধর্মের নানা প্রতীক কে জাতীয়তাবাদ নির্মাণ পর্বে ব্যবহার করেছেন। সচেতন ভাবে অবশ্যই এটা তাঁদের কোন সা স্প্রদায়িক অভিপ্রায়ের প্রকাশ নয়। কিন্তু সম্প্রদায় সচেতন ভাবে তাঁরা যে ধর্মীয় চিহ্নগুলিতে ব্যবহার করেছেন তার ফল হয়েছে সুদুর প্রসারী। বিপিন চন্দ্র পাল এই চরমপন্থী জাতীয়তাবাদকে বলেছেন 'নিউ স্পিরিট'। তাঁর চিন্তায় সম্প্রদায় সচেতনতার সাথেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ভারতীয় মূলস্রোতের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে নিজেদের অবস্থান বজায় রাখতে পারবে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

কিন্তু অরবিন্দ ঘোষ বা বাল গঙ্গাধর তিলকের মধ্যে এই ধর্মীয় অবস্থান আরো তীব্র ছিল। মহারাষ্ট্রে তিলকের গো-রক্ষার প্রতি সমর্থন এবং শিবাজী উৎসব একটি জনসংযোগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ধর্মের অনুপ্রবেশ নিয়ে সেই সময়ে কেউ কেউ সচেতন করেছিলেন। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'লোহিত' প্রবন্ধ এবং 'গোরা' বা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে অতি নির্দিষ্টভাবে এই ধর্মীয় উপাদানের ব্যবহারের বিরোধিতা করেছিলেন। ভারতীয় মূল সত্তার বৈচিত্রের সাথে যে কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয় বা অন্যান্য আত্মপরিচয় সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সেকথা রবীন্দ্রনাথ বারংবার উল্লেখ করেছেন। আমাদের অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মধ্যেও যে এই ধর্মীয় বিষয়টি সক্রিয় ছিল সেকথা বিস্তৃত ভাবে লিখেছেন হেমচন্দ্র দাশ কানুনগো তাঁর 'বাঙলার বিপ্লব প্রচেষ্টা' গ্রন্থে।

তাঁর বিখ্যাত উত্তরপাড়া বক্তৃতায় (৩০ মে, ১৯০৯) অরবিন্দ ঘোষ বলেন, "I say no longer that nationalism is a creed, a religion, a faith; I say that it is Sanatan Dharma which for us is nationalism". এখানে সনাতন ধর্ম বলতে অবশ্যই অরবিন্দ ঘোষ প্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্মকেই বুঝিয়েছেন। তবে অন্য কোন ধর্ম সম্পর্কে কোন রকম বিদ্বেষ ঐ বক্তৃতায় নিহিত ছিল না।

লালা লাজপৎ রাই এবং মদন মোহন মালব্য একই সাথে জাতীয় কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার নেতা ছিলেন। ১৯২৫ সালে হিন্দু মহাসভার কলকাতা অধিবেশনে লালা লাজপৎ রাই সভাপতিত্ব করেন। সেখানে তিনি হিন্দুদের জন্য কতগুলি সুপারিশ পেশ করেন যা অতি তাৎপর্যপূর্ণ। দুটি সুপারিশ ছিল এইরকম (১) যে সমস্ত হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাঁদের পুনঃ ধর্মান্তরিত করণের প্রচেষ্টা করা; এবং (২) সমস্ত রাজনৈতিক প্রশ্নে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। একই সঙ্গে মুসলিম ও খ্রিষ্টানদেরও লাজপৎ রাই সুসম্পর্ক বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছিলেন। অবশ্য উপরের দুটি সুপারিশের সাথে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার আহ্বান কতটা বাস্তবোচিত তাই নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে।

অপর দিকে ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময় থেকেই সংখ্যালঘু মুসলিম আত্মপরিচয় ভিত্তিক রাজনীতির ও জন্ম। স্পষ্টতই চরপন্থী নেতৃবৃন্দের জাতীয়তাবাদী ভাবনা এই সংখ্যালঘু মানুদের উচ্চশাকে স্পর্শ করতে পারেনি। কংগ্রেস রাজনীতি কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ার ফলে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও সুযাগ পেলেন স্বতন্ত্র আত্ম ত্মপরিচয় ভিত্তিক রাজনীতির প্রেক্ষাপট উন্মোচন করতে। আলিগড়ে প্রতিষ্ঠিত 'মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ', এই সংখ্যালগুত্বের প্রথম ভাষ্যের যোগান দিল। উত্তর ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ মূল স্রোতের জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রতিস্পর্ধী একটি সংখ্যালঘুর রাজনীতির জন্ম দেওয়ার জন্য তৎপর হলেন। 'মুসলিম লিগ' ঢাকায় গঠিত হলেও তার ডালপালা ক্রমশই বিস্তৃত হতে লাগলো।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

১৯৪০ সাল অবধি গাঁধীজির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস রাজনীতি যে সমন্বয় তৈরি করেছিল তাতে হিন্দু বা মুসলিম সম্প্রদায়িক রাজনীতি জনতার মনে স্থান পায়নি। ১৯৩০ সালে মুসলিম লিগের এলাহাবাদ সম্মেলনে কবি ও দার্শনিক মহম্মদ ইকবাল সর্বপ্রথম মুসলিমদের জন্য পৃথক স্বয়ত্ত শাসন দাবি করেন। ইকবাল বলেন, 'I would like to see the Punjab, North West Frontier Province, Sind, and Baluchistan amalgamated into a Single State'। ইকবাল তাঁর পরিকল্পনায় বাঙালিদের জন্য কোন জায়গা রাখেননি। তবে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য পৃথক অঞ্চলের দাবি আর দেশভাগ করে পাকিস্তান গঠনের চিন্তা এক ছিল না। কিন্তু 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র প্রথম উত্থাপন' ঐ বক্তৃতাতেই হয়েছিল। আশ্চর্যজনকভাবে ১৯৩০-এর যে সম্মেলনে মহম্মদ ইকবাল মুসলিমদের তরফে ঐ দাবি করেছিলেন সেখানে উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র পঁচাত্তর জন।

দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রবলাকার ধারণ করে ১৯৪০-এর মুসলিম লিগের লাহোর সম্মেলনে। সেখানে মহম্মদ আলি জিন্নাহ স্পষ্ট ভাষায় মুসমিলদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের দাবি করেন। তাঁর ভাষায়, "The Hindus and Muslims belong to two different religions Philosophies, social custom and literature....To yoke together two such options under a single state, one as a numerical majority and the other as a majority, must lead to gorwing discontent and the final destruction of any fabric that may be so built up for the government of such a state."

অর্থাৎ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জিন্নাহ্ বললেন যে হিন্দু এবং মুসলিমরা ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং দার্শনিক ভাবে পৃথক দুটি জাতি সত্তা এবং এদের একই রাষ্ট্রীয় অধীনে রাখলে বিপর্যয় অনিবার্য। জিন্নাহর ঐ চাহিদা ক্রমইশই ব্যপ্তি লাভ করতে থাকলো এবং ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার সাথে দেশভাগ অনিবার্য হয়ে উঠলো।

চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী বক্তব্যের অন্তরে হিন্দু ভাবাবেগ থাকলেও তা অন্য ধর্মের বিষয়ে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেনি। হিন্দুদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রও চায়নি। কিন্তু ১৯২০ র দশকে একপ্রকার অসহিষ্ণু হিন্দুত্বের দর্শনের জন্ম হ'ল। মহারাষ্ট্রের নেতা বিনায়ক দামোদর সাভাকার আন্দামান সেলুলার জেল থেকে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন রত্নগিরি জেলে। সেখানে বসে তিনি লিখে ফেলেন 'Hindutva : Who is a Hindu'? শীর্ষক পুস্তিকাটি। সেটা ১৯২৩। এটি 'হিন্দুত্ব' রাজনৈতিক দর্শনের আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। এখানে অত্যন্ত স্পষ্টভাষার ভারতীয় জাতীয় সত্তার সাথে হিন্দু ধর্মবলম্বীদেরই একমাত্র অন্বিত করার কথা বলা হয়। 'পিতৃভূমি' এবং 'পুণ্যভূমি'র ধারনা নিয়ে আসা হয় সেখানে স্পষ্ট উচ্চারণ ছিল যে, ভারতীয় হ'তে গেলে ঐ দুটি শর্ত পুরণ করতে হবে। কারুর পূ র্বপুরুষ, এদেশের মানুষ হলে সেটা যেমন 'পিতৃভূমি' তেমনি 'পুণ্যভূমি' হ'লে মানুষের

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

রাষ্ট্রের প্রতি ভালাবাসা তৈরি হয় না। তাই ভারত যাদের 'পুণ্যভূমি' নয় তাদের স্বদেশ প্রেম সন্দেহ জনক। অত্যন্ত ভাবেই সাভারকার 'ধর্ম' ও 'জাতীয়তাবাদ' তথা সামগ্রিক রাজনীতি কে জুড়ে দিলেন।

ঐ গ্রন্থ রচনার দুই বছরের মধ্যেই ১৯২৫ সালে গঠিত হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ (RSS)। এটি হিন্দু পুরুষদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে একটি সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন। এই রকম একটি সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা প্রথমে করেছিলেন 'আর্য সমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। কিন্তু অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সেই চেষ্টা সংগঠিত করেন কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। তিনি হিন্দু সামাজিক সংগঠনের সাথে 'রাষ্ট্রীয়' শব্দটি জুড়ে দিয়ে পুরো মাত্রায় সামরিক, একমাত্রিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোকে অন্বিত করলেন। হেডগেওয়ারের প্রয়াণের পর সঙ্ঘচালক হল মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর। তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা এবং লেখনী সরাসরি ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে সোচ্চার হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক ঘৃণার রাজনীতির ভিত্তি প্রস্তুত করেছে।

স্বাধীনোত্তর ভারতে অদ্যাবধি ধর্ম ও রাজনীতির বিচ্ছেদ ঘটিয়ে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির জন্ম সামগ্রিক ভাবে দেওয়া সম্ভব হয়নি। পাকিস্তানের জন্মের পর এদেশে মুসলিম লিগ স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হয়ে পড়েছে। অপ্রাসঙ্গিক ও হয়েছে। হিন্দু মহাসভাও রাজনৈতিক দল হিসেবে তার জনভিত্তি হারিয়েছে। কিন্তু নবরূপে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রভাব ক্রমশই বিস্তৃত হয়েছে। স্বাধীনতার পর সঙ্ঘের নেতৃবৃন্দ ক্রমশই উপলব্ধি করলেন যে তাঁদের মতামতের প্রতিফলনের জন্য একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হল অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘ। দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৯৫২ র প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জনসঙ্ঘ তিনটি আসনে জয়লাভ করে। সংসদে শ্যামাপ্রসাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকেন। কিন্তু কাশ্মীর প্রশ্নে তাঁর অনড় মনোভাব ছিল। পারমিট ছাড়াই জোর করে কাশ্মীরে প্রবেশ করতে যান এবং সেখানে গ্রেফতার হন। কারান্তরালে তাঁর মৃত্যু হয়। স্পষ্টতই জনসঙ্ঘের প্রসারে ধাক্কা লাগে। এছাড়াও শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর জনসঙ্ঘ হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরে। বলরাজ মাধক, দীনদয়াল উপাদ্যায়ের নেতৃত্বে জনসঙ্ঘ ক্রমশই হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডাগুলি সামনে নিয়ে আসে। কিন্তু ১৯৬৮ তে দিনদয়াল উপাধ্যায় ও মারা যান। এরপর নেতৃত্বে উঠে আসেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। লালকৃষণ আডবাণী প্রমুখ। ১৯৭৭-এর নির্বাচনে জনসঙ্ঘ জয়প্রকাশ নারায়নের আহ্বানে জনতা পার্টিতে মিশে যায় এবং ইন্দিরা গাঁধীকে পরাজিত করে প্রথম বারের জন্য কেন্দ্রে অকংগ্রেসী সরকার চালু করে। কিন্তু বিবাদ বাঁধে সঙ্ঘবাদীদের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের। এর ফলে সঙ্ঘবাদীরা সরকার ও জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং ১৯৮০ তে অটল বিহারী বাজপেয়ীর সভাপতিত্বে জন্মলাভ করে ভারতীয় জনতা পার্টি। প্রথমে সঙ্ঘের মৌলিক অ্যাজেন্ডাগুলিকে সরিয়ে রাখলেও ১৯৮৫ সাল থেকে লালকৃষ্ণ আডবাণীর নেতৃত্বে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

নতুন করে হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডাগুলি সামনে চলে আসে। ১৯৬৩ তে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তার ছায়া প্রসারিত করে অয়োধ্যায় রাম মন্দির আন্দোলনের সূত্র ধরে। কাশ্মীরে ৩৭০ধারা বিলোপ, অভিন্ন দেওয়ানী বিধি ইত্যাদি হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডার সাথে যুক্ত হল রামজন্মভূমি আন্দোলন। দেশজুড়ে রথযাত্রা ভোট টানলো। ১৯৮৯-র নির্বাচেন ৮১টি আসন পেল বিজেপি। কেন্দ্রে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের সরকারকে সমর্থন জানালো। কিন্তু বিহারে লালুপ্রসাদ যাদব রথযাত্রা আটকানোয় এবং মণ্ডল কমিশন ইস্যুতে বিরোধিতায় দশ মাসের মাথায় সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়া হল।

এরপর ১৯৯২ এর ৬ ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস করলো সঙ্ঘবাদী করসেবকরা। দেশজুড়ে এক অস্থির সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি। গোষ্ঠী সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন উভয় সম্প্রদায়ের বহু মানুষ। ধর্মীয় রাজনীতির যে বিষবৃক্ষ প্রোথিত হয়েছিল তা পল্লবিত হয়ে উঠলো।

অধুনা তা এক বিশেষ রূপ ধারণ করেছে। অধিকতর প্রবল ভাবে সঙ্ঘ পরিবার কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন নরেন্দ্র মোদীর সরকারের নীরবতা এবং সক্রিয় প্রশ্রয়ের যুগলবন্দিতে দেশের সংখ্যালঘু মানুষের মনে প্রবল ভীতির সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছে। ধর্মীয় রাজনীতির বিরোধীতা করার জন্য সাংবাদিক গৌরি লঙ্কেশ, অধ্যাপক কালবুর্কি, গোবিন্দ পানসারে প্রমুখ নিহত হয়েছে। গোরক্ষকদের তান্ডবে প্রাণ হারিয়েছেন বহু নিরীহ মানুষ। নতুন করে একটি তীব্র সহিষ্ণু ধর্ম রাজনীতির বাতাবরণ নির্মিত হয়েছে। ভারতের সমাজ জীবনে আবার নতুন করে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে যে সংবিধানের মৌলিক ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান আমরা স্থিত থাকবো না কি ধর্মীয় রাজনীতির ঘোলাজলে মাছ ধররো?

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner